ভাল মন্দ এবং ভয়

আজিজুস সামাদ আজাদ ডন

ভূমিকা

একটা ব্যক্তিগত গল্প দিয়ে শুরু করি। আমার বই পড়ার অভ্যাস নিয়ে কিছু কথা বলেছি বাবার স্মৃতি কথায়। ৩/৪ বছর বয়স থেকে মায়ের সাথে ঢাকা ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীতে যেয়ে বসে বসে বইয়ের পাতা উল্টানো থেকে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। মা হয়তো লাইব্রেরীতে তার পড়া লেখার সুবিধার্থেই আমাকে বই পড়ার বিষয়ে উৎসাহিত করতে জানিয়েছিলেন আমার মামাদের যাতে পড়ায় ব্যাঘাত না ঘটে সে কারণে বাড়ির ছাদে উঠে তাদের বই পড়ার ইতিহাসের কথা। আমার আরেক চাচাতো ভাই তো যখন যেখানে সুযোগ পেতেন বই পড়তেন, অবশ্য তিনি নির্দিষ্ট ধরনের কিছু বই পড়তেন। আর বাবার জেলে যাওয়া মানেই ছিল বাবার জন্য বিশাল বিশাল বই নিয়ে জেলখানায় দিয়ে আসা, আর জেল থেকে বেড়িয়ে আসবার পরেই আমরা পেতাম বাবার লেখা কবিতা এবং অন্যান্য লেখার সম্ভার। উনি আমাদের নিজেই পড়ে শোনাতেন। ছোট ছিলাম, বুঝিনি কি লিখেছেন কিন্তু মা-খালারা বেশ মনযোগ দিয়ে শুনতেন।

আর একজনের কথা না বললেই নয়, হাসু আপার কথা, আমার খালাতো বোন, আমার বহু ভাল অভ্যাসের কারণ ছিলেন তিনি। ভাল্ অভ্যাসের মধ্যে একটি ছিল বই বাছাই করায় ওনার ভূমিকা। উনিই একদিন বললেন রাজশেখর বসুর কথা। পড়লাম। অভিভুত হলাম। তিনি যে শুধু আমার বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলায় সহযোগীতা করেছেন সেটা নয়, আরও বহু নতুন নতুন বিষয়ও আমাকে শিখিয়েছেন। তারমধ্যে সবচেয়ে মজার একটি বিষয় ছিল অদৃশ্য কালি। লেবুর রস দিয়ে বানানো সেই কালি দিয়ে লেখা একটি চিঠি যখন মোমবাতির ওপর রেখে দৃশ্যমান করলেন তখন বেশ বিস্ময়াভুত হয়েছিলাম। তবে ১৯৯৫ সালে আমার জন্য আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সেইন্ট পিটার্সবুর্গের এক মধ্য বয়সী ব্যক্তি নাকি দিনে দুপুরে ব্যাংক ডাকাতি করেছিল কোন রকম লুকোছাপা না করেই। এমনকি ব্যাংকের ক্যামেরার সামনে এসে সুন্দর একটা হাসিও দিয়েছিল। সেদিন রাতে যখন ব্যক্তিটিকে গ্রেফতার করা হয় তখন সে বিস্মিত হয়ে বলেছিল, এটা কি করে সম্ভব, আমি তো লেবুর রস ভাল ভাবে লাগিয়েছিলাম, আমার তো অদৃশ্য থাকবার কথা। বেচারার লেবুর রসের জ্ঞান যে ক্যামেরায় কাজ করবে না সেটা বুঝতেই পারেনি।

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ড" লেখাটির পর কেউ এই বিষয়ে কোন বিরুপ মন্তব্য না করায় সাহস বেড়ে গেল, কারণ, বিষয়টিতে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাবনা আছে এবং সেই ভাবনাকে প্রমান করার দায় তার নেই। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিজ্ঞান এখনো এমন পর্যায়ে আছে যে, বেশীরভাগ তাত্বিক বিষয়ে মতপার্থক্য থাকায়, তত্ব কেন্দ্রীক কোন বিষয়ে কেউ কিছু বলার পর সেটাকে "না" বলার মত প্রমান বিজ্ঞানে থাকার কোন কারণ নেই। ভাবনার এই অবাধ স্বাধীনতা অবশ্যই মানুষকে দুঃসাহসী করে তোলে। সেই জ্ঞান কখন যে লেবুর রসের কাহিণীর মত সীমা অতিক্রম করে সেটা নিয়ে কিছু দুশ্চিন্তা থাকতেই পারে। তবে থিওলজিকাল লেখার একটা সুবিধা হল, এটা কেবলই নিজস্ব ভাবনা। আমরা সবসময়ই নির্ভর করি আমাদের ছোট বেলা থেকে দেয়া তথ্যের ওপর। আমার নাম কি, আমি কে, আমার বাড়ি কোথায় ইত্যাদি সবই আমাকে শেখানো হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাবে আমার বিশ্বাসে স্থান করে দেয়া হয়েছে, এটাই মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস ও আস্থার প্রথম স্তর, এটাই মানুষের দোষ বা গুন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে আমার লেখার অনুপ্রেরনা হিসেবে সবসময়ই "দা ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন", দা গ্র্যান্ড চেজ বোর্ড" সহ আরও দু'তিনটি বই কাজ করে। এই লেখাও সেটার ব্যতিক্রম নয়। আমি দেশের

রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক সমস্যা নিয়ে না লেখায় অনেকেই ক্ষুব্ধ মত প্রকাশ করে থাকেন। এই লেখাটির মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে পারি, আমি মনে করি আমাদের দেশ সঠিক রাস্তাতেই আছে, কিছু সমস্যা যদি থেকেও থাকে সেটা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের কারণে অথবা খুবই আঞ্চলিক ও সাময়িক এবং তার সমাধান সঠিক সময়েই হয়ে যাবে।

গিলগামেশ

ঢাকার ট্রাফিকের কারণে বছর খানেক আগেও বাড়ি থেকে বের হবার আগে তিনবার চিন্তা করতাম কিন্তু এখন আর করিনা। কারণ আর কিছুই না, টেকনোলজির উন্নতির সাথে আমি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি। "সার্ভাইভাল ফর দা ফিটেস্ট" থিয়োরীর চাইতে এক্ষেত্রে কাজ করেছে পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে ট্রাফিকের মাঝে বসে গুগুল আন্টির কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি অথবা অডিও বই শুনি। এরকম একটা সময়েই পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যই বলি আর উপকথাই বলি, "গিলগামেশ" এর সাথে আমার সংযোগ ঘটে। গিলগামেশের রচনাকাল নিয়ে মতপার্থক্য আছে। তবে কখনোই এটা সারে চার হাজার বছরের নীচে নামেনি।

বাংলা কাব্যশাস্ত্রে রস ৯ প্রকার। এগুলো হলো–শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। কেউ কেউ এর সাথে "বাৎসল্য" নামক একটি অতিরিক্ত রসের কথা বলে থাকেন। এই অতিরিক্ত প্রকরণ যুক্ত করলে রসের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টি। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে গুগুল আন্টি তো আছেই। "গিলগামেশ" শুনতে যেয়ে সব রসকেই সেখানে খুঁজে পেলাম, অর্থাৎ, ত্রুটিহীন কাব্য। কিন্তু গিলগামেশের মৌলিকতা হল, সেখানে একটি মাত্র "ভয়" নামের রস দিয়ে সমস্ত বিশ্ব জগত পরিচালিত হচ্ছে বলে বলা হয়েছে এবং "ভয়" নামের রসের প্রকারভেদ করা আছে সাত ভাগে, হারাবার ভয়, হেরে যাবার ভয় থেকে শুরু করে সবচেয়ে বড় ভয় মৃত্যু। অদ্ভুত কথা! শুধু ভয় দিয়েই বিশ্ব জয়। গিলগামেশের গল্পটা একটু বলে যাই।

গিলগামেশ একজন পরাক্রান্ত রাজা কিন্তু একজন খারাপ রাজার সব উপাদান তার মাঝে বিদ্যমান, অর্থাৎ, অত্যাচারী থেকে শুরু করে সবকিছু। তার মা একজন দেবী কিন্তু বাবা একজন মানুষ, অতএব, তাকে অর্ধ মানব অর্ধ দেবতা বললে ভুল হবে না। সেই একজন অর্ধ মানবের বিভিন্ন কর্মকান্ড আর ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ হিসেবে রূপান্তরিত হবার গল্পই গিলগামেশ। গল্পের মোট সাত "ভয়" এর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মৃত্যু ভয়কে। ভাল মন্দের সংমিশ্রনেই মানুষ তৈরী এবং মানুষ সবসময়ই বীরোচিত ও নায়কোচিত কর্মকান্ড এবং তার ক্ষমতার প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের মাঝ দিয়ে নিজেকে মৃত্যঞ্জয়ী করে তুলতে চায় কিন্তু সে ঘুমকেই জয় করতে পারে না। যখন সে বুঝতে পারে তার সীমা নির্ধারিত হয়ে আছে নশ্বর দেহের বিনাশের মাঝে, তখনই সে উপলব্ধি করে অবশেষে সে একজন শুধুই মানুষ। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল, প্রায় পাঁচ হাজার বছর পর গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের মুভি, সাহিত্য, কাব্য সব কিছুই আবর্তিত হয়েছে মাত্র তিনটি রসের উপর ভিত্তি করে, ক্রোধ, ভয়, প্রেম। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পর ভয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে মাত্র আর দু'টি রস, যে দু'টি রসকে আবার গিলগামেশে ভয় দিয়েই বিশ্লেষন করা হয়েছে।

ভাল–মন্দ, সত্য–মিথ্যা

ভাল–মন্দ–সত্য–মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারন কিভাবে করা সম্ভব। নেপোলিয়ন, আলেক্সেন্ডার, তৈমুর লং, হিটলারের মত কয়েকটি ঐতিহাসিক নামকে পাশাপাশি বসালে প্রথমেই যে দ্বিমুখী সত্য সামনে ধরা দেয়

সেটার সমাধান পাওয়া কষ্টসাধ্য। এরা সবাই বিশ্ব নিয়ন্ত্রন নিতে চেয়েছিল। হিটলার ব্যর্থ হলেও বাকিরা তো সাফাল্য অর্জন করতে পেরেছিল। তাহলে আলেক্সেন্ডারের নামের সাথে গ্রেট লাগানো হলেও তৈমুর লং কে খলনায়ক হিসেবে চিহ্নিত করার একটা প্রচেষ্টা বেশ লক্ষনীয়। আবার নেপোলিয়নের বিষয়ে ইতিহাসবেত্তাদের একটি মাঝামাঝি অবস্থান পরিলক্ষিত হবার কারণে সত্য-মিথ্যা-ভাল-মন্দ কেন্দ্রীক ভাবনা সমুহ এলোমেলো হ'য়ে যায়।

ইংরেজীতে দুটি শব্দ Ethic, Moral কিন্তু বাংলা পরিভাষায় শব্দ দুটি একাকার হয়ে গিয়েছি নীতি বা আদর্শের কাছে। গুগুল আন্টি ইংরেজী শব্দ দু'টিকে চিহ্নিত করেছে দুই ভাগে। দু'টোই ভাল এবং মন্দের পার্থক্য নির্ধারণে ব্যবহৃত হ'য়ে মানুষের নৈতিকতা তৈরী করে কিন্তু Ethic এর অর্থে বলা হচ্ছে, যখন বাইরের কোন শক্তি বা ব্যক্তি বা আইন ভাল ও মন্দের সীমা নির্ধারন করে, অপরপক্ষে Moral এর অর্থ নির্ধারিত করা হয়েছে, যখন কোন ব্যক্তি নিজেই নিজের ভাল মন্দের সীমা নির্ধারন করে। ধরে নেই দুই দেশের মাঝে খেলা চলাকালীন সময়ে এক দর্শক খেলার মাঠে ঢুকে পরায় নিরাপত্তা রক্ষীরা দৌড়ে এলো ঐ দর্শককে গ্রেফতার করার জন্য কিন্তু কোন এক দলের খেলোয়ার এগিয়ে এসে ঐ দর্শককে নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে গ্রেফতার হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিল। সমস্যা হল, খেলা শুরু হবার আগেই খেলোয়ারদের নিরাপত্তার স্বার্থে খেলার Ethic হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল, কোন দর্শক মাঠে ঢোকার চেষ্টা করলেই তাকে গ্রেফতার করতে হবে কিন্তু উক্ত খেলোয়ার মহোদয় তার নিজস্ব ভাল মন্দের সীমা নির্ধারন করে তাকে গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচালেন। এখন আমার প্রশ্ন হল, Ethic এবং Moral এর এই ধরনের সরাসরি সংঘাতের সময় কোনটাকে আমরা ভাল মন্দের শেষ সীমা হিসেবে গ্রহণ করবো।

আরেকটি সমস্যা আমার সামনে পাহারসম হ'য়ে দাঁড়ালো খবরের কাগজ পড়তে যেয়ে। বর্তমানে প্রতিটি ভাল সংবাদ পত্রেরই নিজস্ব পাঠক সমাজ থাকে। এই পাঠক সমাজ কি ভাবে গড়ে ওঠে সেটা ভাবতে গিয়েই সামনে এলো খবর বা সংবাদ, ফিচার ও কলামের মধ্যে পার্থক্য। গুগুল আন্টির কাছে গিয়ে যেটুকু বুঝলাম, খবর বা সংবাদ সাধারণত শুধু যা ঘটেছে সে সম্পর্কিত তথ্য গুলো দিয়ে সরাসরি পাঠকের সামনে হাজির করা। ঘটনা ঘটার পর সংবাদ ছাড়াও ঘটনাকে অনুসরণ করতে যে সমস্ত পাঠকেরা ঘটনা সম্পর্কে আরও বেশী জানতে চান বা ঘটনার কারণ ও করণ সম্পর্কে জানতে চান তাদের জন্য পরবর্তিতে তৈরী করা হয় ফিচার। আর কলাম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে বলে বুঝেছি, সমসাময়িক ঘটনা বা নির্দিষ্ট কোন বিষয় নিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দের একটি লেখা, যেখানে ওই বিষয়ের কে, কি, কখন, কোথায়, কেন এবং কিভাবে ধরনের প্রশ্ন-উত্তর ও ব্যাখ্যা এবং বিকল্প ব্যাখ্যা সমুহ থাকবে।

এইবার বুঝলাম কিভাবে একটি ভাল সংবাদপত্র তার নিজস্ব পাঠক সমাজ গড়ে তোলে। প্রথমেই তাদের পরিবেশন করার কথা সংবাদ। কিন্তু আজকাল অনেক সংবাদ পত্রই নিজস্ব পাঠক সমাজ গড়ার লক্ষে সংবাদের বদলে প্রথমেই নিয়ে আসে ফিচার, অর্থাৎ, মূল ঘটনার তথ্যকে প্রাধান্য না দিয়ে বা কিছু তথ্য আড়াল করে, ঘটনা সম্পর্কিত তাদের নিজস্ব মতামত, কারণ ও করণ তুলে ধরে, তারপর সেই ঘটনা সম্পর্কিত সম্পাদকীয় এবং আর্টিকেলের মাধ্যমে ঐ বিষয়ের উপর উক্ত সংবাদ পত্রের নিজস্ব কে, কি, কখন, কোথায়, কেন এবং কিভাবে ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর ও ব্যাখ্যা এবং বিকল্প ব্যাখ্যা সমুহ উপস্থাপন করে। তাহলে সাংবাদিকতা আর হলুদ সাংবাদিকতার পার্থক্য রইলো কোথায়!! তথ্যকে যখন নিপুণতার সাথে পরিচালনা করে স্বকার্যে ব্যবহার করা হয় তখনই তো হলুদ সাংবাদিকতার ক্ষেত্র তৈরী করা হয়। নাহ, বর্তমান কমার্শিয়ালাইজেশনের যুগে সংবাদকে পণ্য করাটাকে অযৌক্তিক না বলে, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়াটাই শ্রেয়।

একটি পিপড়ার আত্মকাহিনী বড়ই সীমিত। তার মত নির্বোধ প্রানী তাদের সামাজিক সংগঠিত অবস্থায় একটি

সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলে, যেখানে সবকিছুই মনে হয় একটি একক ব্রেইনের মাধ্যমে সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। শ্রমিক পিপড়া গড়ে চলেছে, সৈনিক পিপড়া রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে চলেছে, সংগ্রহকারীরা খাদ্যাদি জমা করছে, রাণী পিপড়া তার বসতি বাড়িয়ে চলেছে। কোথায়ও কোন বিশৃঙ্খলার লক্ষন মাত্র নেই। অথচ একটি একক পিপড়ার কোন ক্ষমতাই নেই। ঠিক একই ভাবে সমাজবদ্ধ প্রানী হিসেবে আমরা সুন্দর ভাবে এগিয়ে চলেছি সমাজের নিয়ম মেনে, ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে, দেশের আইন মেনে, বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মেনে। এখানে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একজন একক মানুষের অবস্থান নেই বললেই চলে বোধহয়, ঐ পিপড়ার মতই। আমার একটি লেখায় আলোচনা করেছি, সকল এটমের অবস্থান প্রায় শুন্য এবং থিওরি অব প্রবাবিলিটি অনুযায়ী মানুষের জন্মই একটা অবাস্তবতা। দুই প্রেক্ষাপটের যোগফল অবশ্যই শুন্য। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এই শুন্য মানুষের কর্ম প্রনালী বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে, একটি মানুষ শুধু দৌঁড়েই চলেছে কিন্তু সেই একক শুন্য মানুষই আবার বিশ্বসভ্যতা গড়ে তোলার একমাত্র একক বলে স্বীকৃত।

ডারউইনের এভলিউশন তত্ব একটা তত্বই। উনি নিজেই এর নাম দিয়েছেন "ইভোলিউশন থিয়োরি" কিন্তু এই থিয়োরীকে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসে রুপান্তরিত করতে চান তাদের উদ্দেশ্য নিয়েই আমি সন্দিহান। বানর-শিম্পাজিরাই যদি আমার পূর্বপুরুষ হয়ে থাকে তাহলে এখনো যে বানর-শিম্পাজিরা বর্তমান, তারা মানুষ হ'ল না কেন সেটা নিয়ে কেউ গবেষণা না করাটা খুবই পীড়াদায়ক। ডারউইন তত্বে বিশ্বাসীরা উদাহরণ দিয়ে থাকেন, বানর-শিম্পাঞ্জির ডিএনএ বেইজের সাথে মানুষের ডিএনএ বেইজের পার্থক্য মাত্র এক পার্সেন্ট কিন্তু যে কথাটি তারা বলেন না সেটা হল এই এক পার্সেন্টের মানে কি। মানুষের ডিএনএ বেইজ গঠিত হয়েছে বিশ বিলিয়ন দিয়ে, অর্থাৎ, ১% এর পার্থক্য ২০ মিলিয়ন, বিশাল ফারাক। শুধুমাত্র উপস্থাপন ভঙ্গিজনিত কারণে এই বিশাল ফারাককেও মনে হবে অতি সামান্য।

মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণের সময় মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণের বর্তমান সীমান্ত ১৩.৭ বিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত মহাবিশ্ব শুধুই ছড়িয়েই পরছে এবং গতিও বেড়েই চলেছে। আমার প্রশ্ন খুব সামান্য। আমরা পৃথিবীর তুলনায় মহাবিশ্বের এই অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে চলেছি। কিন্তু পৃথিবীর অবস্থান এই মহাবিশ্বে কোন সময়ে অবস্থিত সেটা জানা আছে কি?? আমরা কি পৃথিবীর বর্তমান অবস্থানের অতীত দেখছি নাকি ভবিষ্যত দেখছি? এটা হয়তো অমুলক নয় যে, ১৩.৭ আলোকবর্ষ কোন সময়ই না মহাবিশ্বের ইতিবৃত্তে, আমরা হয়তো এখনও কেবলই সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থান দেখছি। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কি যায় আসে মহাবিশ্বের সৃষ্টির ইতিহাসে আমাদের অবস্থানগত বিচারে? আমরা যেখানেই আছি, এগিয়ে চলেছি অজানা শেষের দিকেই। ভাল-মন্দ, আলো-অন্ধকার, সত্য-মিথ্যা সব কিছুরই পার্থক্য নির্ধারন করা হয় সেই অজানা ভয়ের কারণেই।

ধরে নেই কোন খেলার কথাই, হোক সেটা দলীয় বা দু'জনের খেলা। খেলায় জেতার সম্ভবনা আছে বলেই সেই খেলায় এতো উত্তেজনা। সাফল্যের যদি অগ্রিম শত ভাগ নিশ্চয়তা থাকে তবে তো আর খেলার প্রয়োজনীয়তাই থাকেনা। অনিশ্চয়তার ভয়ই প্রান দেয় পথচলায়। ধরে নেয়া যাক, কাউকে দুটো বিকল্প দেয়া হল,
তোমার সত্য জানার প্রয়োজন নাকি জীবনে সুখী হওয়া প্রয়োজন।
আমি মনে করি বেশীরভাগ মানুষ সত্য বেছে নেবে। কারণ, অন্ধকারে নিমজ্জিত সুখী মানুষের অর্জন শুধুই অন্ধকার। এই অর্জন শব্দটার ব্যাখ্যা আসলে বর্তমান বিশ্বকে সুখী না করে অসুখী করে তুলছে। অথচ এই অর্জন কখনোই সত্যকে অস্বীকার করার মাঝ দিয়ে আয়ত্তাধীন করা সম্ভব নয়। এবার প্রশ্ন এসে দাঁড়াতে পারে সত্য মানে কি শেখানো ও বলে দেয়া তথ্য গুলোর ওপর নির্ভর ক'রে গড়ে ওঠা কিছু Moral, Ethic ও বায়বীয় ভাবনা মাত্র?

<u>সভ্যতার সময় বিন্যাস</u>

ইতিহাসবেত্তাগণ মনে করেন, হরপ্পা-মহেঞ্জাদারোর ইতিহাস নাকি চার হাজার বছরেরও পুরোনো। চলে যাই পিরামিডের কাছে। পিরামিডও নাকি ঐ প্রায় চার হাজার বছর আগের। কি বিষয়? হিসেবে একটা সাযুজ্য লক্ষ করার কারণে আবার গুগুলের কাছে গেলাম। যা জানলাম তাতে বুঝলাম, বিজ্ঞানের নামে আমাদের অর্ধ সত্য তথ্য দেয়া হচ্ছে। কারণ, কার্বন পরীক্ষা থেকে আরও যত ধরনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই বয়স নির্ধারন করা হচ্ছে সেই পদ্ধতি এখনো ঐ চার হাজার বা সারে চার হাজার বছর পরের আর কোন বয়স নিশ্চিত ভাবে বলতে পারেনা, এগুলো হয় অনুমান নির্ভর কিছু সংখ্যা মাত্র নয়তো ভাওতাবাজি; আহারে, বেচারা গিলগামেশের বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় থাকলে তার বয়সও আর বাড়তো না, তারও অমরত্বের সমস্যার সমাধান হ'য়ে যেত।

বিভিন্ন কারণে অনেকেই মনে করেন আমাদের বর্তমান মানব সভ্যতা প্রায় ৮০০০ বছরের পুরানো, অর্থাৎ, আদম সন্তানের এই পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব প্রায় আট হাজার বছর আগে। প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে কোন কথা বলতে চাইলে পিরামিড প্রসঙ্গ আসবেই। এটা আমাদের বর্তমানের চলমান কোন সভ্যতার তৈরী কি? অনেকেই মনে করেন পিরামিডের বয়স দশ হাজার বছর বা তার চেয়েও বেশী। তাহলে অন্য পক্ষের বিশ্বাস মতে বলতে হয়, সেই আট হাজার বছর আগে এই পৃথিবীতে আমাদের বর্তমান সভ্যতার আগেও কোন সভ্যতা ছিল যারা পিরামিডের মত অদ্ভুত স্থাপনা তৈরী করেছিল। এই স্থাপনা এতোই অদ্ভুত যে আমাদের বর্তমান সভ্যতার কোন পক্ষই বহু ভেবেও এই স্থাপনা তৈরীর কারণ বা এত্তো বড় বড় পাথর আশেপাশে না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের মানব সভ্যতা কোথা থেকে টেনে নিয়ে এলো আর কিভাবেই বা এতো নিখুঁত ভাবে সাজালো, সেইসব রহস্যের সমাধানে কিছু জল্পনা কল্পনা ছাড়া কোন কূল কিনারা করতে পারেননি।। তিন হাজার বছর আগেই ব্যাবিলনীয় সভ্যতা যদি নীল চকচকে টাইলস বানাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে থাকতে পারে তবে যে আর্কিওলজিস্টরা বিশ্বাস করেন পিরামিড হাজার চারেক বছর আগে বানানো, তাহলে সেই চারহাজার বছর আগে খুব দ্রুত শুকিয়ে যাবার মত কাঁদা মাটি আবিষ্কার হ'য়ে থাকতেই পারে।

পিরামিড ধরনের স্থাপনার সময়কাল, প্রায় একই অক্ষাংশে থাকা এবং সৌর জগতের বিভিন্ন সূত্রের সাথে এইসব স্থাপনার মিল এবং আরও কিছু তথ্য কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয়, যেমন, যদি এটা আমাদের বর্তমান সভ্যতার আগেরই হবে তবে সেটার কোন প্রমান আমরা পাচ্ছি না কেন? কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, নমরুদ থেকে শুরু করে কোন সভ্যতা বা জনপদ যখনই সৃষ্টিকর্তাকে চ্যালেঞ্জ করেছে তখনই সেই সভ্যতার বা জাতির লয় সাধিত হয়েছে, তাদের সকল কিছু সমুলে উৎপাটিত হয়েছে, যেন এমন কিছুর কোন অস্তিত্বই ছিল না। পৃথিবীর ইতিহাসের কোন ক্ষণে, সেই সময়ের সম্পুর্ন বিশ্ব সভ্যতাই যদি সৃষ্টি রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টায় সৃষ্টি কর্তাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে তবে সেই সময়ের বিশ্ব সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং সেই ধ্বংসের জন্য দায়ী থাকবে সেই সভ্যতাই।

বিজ্ঞান ভীতি

আইনস্টাইন তার বিখ্যাত ইকুয়েশন E=MC^2 দিয়ে বিশ্বের তাবৎ শক্তি-ভর এবং গতিকে একটি সূত্রে বেঁধে দেবার পর থেকেই বিজ্ঞানের গতি উড়াল দেবার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। এই সূত্র অনুসারে বিশাল শক্তির আধার পারমানবিক বোমা বিশ্বকে চমকে দিলেও সামরিক শক্তির পরাক্রম অর্জনের তাগিদ থেমে থাকেনি। বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় সকলেই মানব হিতৈষী হলেও তাদের পেছনে কিছু মানুষ থাকে যারা যে কোন মানব কল্যানমূলক আবিষ্কারকে পন্য হিসেবে অথবা যুদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে সভ্যতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে ফেলতে চায়। আরও শক্তি চাইয়ের অন্বেষায় সুপার বোমা তৈরীর নেশা পেয়ে বসার কারনেই হয়তো

ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড সীমান্তে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক গবেষনাগার "সার্ন" এর আবির্ভাব। অদ্ভুত সত্য হল, সার্ন নামের ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারটির অবস্থানও আগের সভ্যতার কেন্দ্র বলে পরিচিত সেই বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পিরামিড গুলোর অবস্থানের +২০ থেকে ৫০ ডিগ্রী) অক্ষাংশে।

কারা এই সার্নের পেছনে কাজ করেছে? ইউরোপের মত বিভিন্ন মতের দেশ গুলোকে শুধু কি বিজ্ঞানের স্বার্থেই এত টাকা খরচ করে এই বিশাল আয়োজনে সম্মত করা গিয়েছে? কি সেই বিজ্ঞান?? "হিগস বোসন" খোঁজার তাগিদ কেন এতো? আমি বিজ্ঞান বিশেষ কিছু না বুঝলেও "হিগস বোসন" এর আরেকটি নাম "গড পার্টিক্যাল" আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে 'সার্ন" এর মূল উদ্দেশ্য নিয়ে। সমগ্র বিশ্বই শক্তি দিয়ে তৈরী। সেই শক্তিকে কোন কিছু দিয়ে বেঁধে রেখে তৈরী হয়েছে পদার্থ। এখন যদি এই বাঁধন ভেঙ্গে ফেলা যায় তবে হয়তো মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্যের সমাধান পাওয়া যাবে কিন্তু সেই সাথে সকল পদার্থকে ভেঙ্গে বিশাল শক্তি উৎপন্ন ক'রে অথবা স্থায়ী এন্টিম্যাটার সৃষ্টি করে ম্যাটার ও এন্টিম্যাটারের ফিউশনে সমগ্র বিশ্বকে উড়িয়ে দেবার শক্তিও যে ঐ সমস্ত যুদ্ধবাজ মানুষ পেয়ে যেতে পারে সেই সম্ভবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এই তত্বকে ষড়যন্ত্র তত্ব হিসেবেই দেখা যেতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, মূলত কোন এক অদৃশ্য লক্ষ নিয়ে একটি গোষ্ঠী সেই হযরত মুসার আমল থেকেই মাইথলজির আড়ালে তাদের নিজ স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। "সার্ন" কে ঘিরে একই তৎপরতা ঘটছে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ থাকবেই। তার ওপরে রয়েছে "সার্ন" কে ঘিরে পশ্চীমা মিডিয়া কর্তৃক প্রচারিত চতুর্থ ডাইমেনশন আবিষ্কার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধুম্রজাল সৃষ্টির পায়তারা। এতোসব ঘটনা দিয়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে, শেষ পর্যন্ত ধর্মের প্রতি আস্থাহীনতা তৈরী ক'রে, মানুষের ধর্মীয় Moral ধ্বসিয়ে দিয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক Ethic এর জন্য যায়গা ক'রে দিয়ে, মানব ইতিহাসকে নতুন করে সাজাবার লক্ষে মানব সমাজকে ইহজাগতিক ও শুধুমাত্র বর্তমান বিশ্বের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে, একটি আত্নীক ও আধ্যাত্নিক বিশৃঙ্খলা তৈরী করার চেষ্টা চলছে কি? গিলগামেশের মত প্রাচীন উপকথাতেও মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী হবার চেষ্টাকে সর্বশক্তিমানের প্রতি চ্যালেঞ্জ আখ্যায়িত ক'রে সর্বশক্তিমানের সাথে মানুষের পার্থক্য খুব মোটা দাগে তৈরী করে দেয়া হয়েছে মৃত্যু এবং ঘুম দিয়ে। নিকট ভবিষ্যতের বিজ্ঞানকে হয়তো সেই চ্যালেঞ্জের দিকেই ধাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

নিকোলা টেসলা বর্তমান বিশ্বের বিশাল পরিবর্তনে মূল ভূমিকা রেখেছিলেন; বিংশ শতকের শুরুটা ছিল তার জয় জয়াকার। ষড়যন্ত্র তত্ব আছে যে, টেসলা'র গবেষণা সমুহকে একটা সময়ে অর্থায়ন করতেন জেপি মর্গান। যে মুহুর্তে জেপি মর্গান মনে করলেন যে, এই মানুষটি টাকার মর্ম বোঝে না, শক্তি অর্জনের জন্য মানব চরিত্রের প্রধানতম উপাদান ভয়কে বোঝেনা, মৃত্যুকে পরোয়া করে না, সেই মুহুর্ত থেকে টেসলার পতন শুরু এবং তার রহস্যময় অন্তর্ধান বা মৃত্যু। অদ্ভুত কথা। যে মানুষটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝেই উচ্চারন করেছিলেন ল্যাপটপ বা স্মার্ট মোবাইল ফোনের কথা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফ্রি যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরী করার কথা, সেই লোকটি গায়েব হয়ে গেল শুধুই কি একজন মানুষের বিরাগ ভাজন হবার কারণে? নাহ, একজন নয়। জেপি মর্গানের পেছনে যারা ছিল তাদের চেহারা গুলো খুব স্পষ্ট না হলেও, ধারনা করা হয়ে থাকে রথচাইল্ড থেকে শুরু করে বিশাল একটা সংঘবদ্ধ দল কাজ করছিল। কেন? এই "কেন" এর উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে তিন হাজার বছর পুর্বের জেরুজালেমের ইতিহাসের কাছে।

রাষ্ট্রের মাঝে রাষ্ট্র

এই লেখা কোন ধর্মেরই বিরুদ্ধে নয়, সকল ধর্মের অতি ধর্মীয় বা মৌলবাদী ও সকল বিষয়ের "অতি" অংশের বিরুদ্ধে। এমন এক সময় লেখাটি লিখছি যখন অনেকেই মনে করছেন যে, চীন-রাশিয়ার পুনরুত্থানে

বিশ্ব অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে যেয়ে অন্যান্য পক্ষকে স্থান করে দেবার সময় সমাগত প্রায়। এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ এবং এই তত্ত্বের বিরুদ্ধ পক্ষ বা তথাকথিত কোন উগ্র ধর্মীয় অথবা উগ্র জাতীয়তাবাদী সমর্থকগণ একচক্ষু বিশিষ্ট হয়ে উঠে বর্তমান সভ্যতার বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

হযরত আদম(আ) থেকে শুরু করে হযরত নুহ(আ), হযরত ইব্রাহীম(আ) সকলেই একাত্ববাদ প্রচার করলেও দুর্বলচিত্তের মানুষের বিচ্যুতি একটি ঐতিহাসিক প্রমানীত সত্য। অবশেষে একাত্ববাদী প্রচারনা ভিত সুদৃঢ় ভাবে মানুষের মনে প্রোথিত করার লক্ষে হযরত মূসা(আ) এর আবির্ভাব। অবশ্য তাঁর অনুসারীরা লাইনচ্যুত হতে বেশী সময় নেয়নি। যে কারণে মূসা(আ) এর জীবিতাবস্থাতেই তাদের অভিশপ্ত জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রায় তিন/চার শত বছর বিভ্রান্তের মত পথে-ঘাটে মরু-প্রান্তরে ঘুরে অবশেষে হযরত দাউদ(আ)এর নেতৃত্বে তাদের ঠিকানা তৈরী হয় জেরুজালেম কেন্দ্রীক "জুডা" অঞ্চলে। হযরত সোলায়মান(আ) এর নেতৃত্ব গুনেই হোক আর যে ভাবেই হোক, তারা প্রায় পাঁচ শত বছর অত্র অঞ্চলে তাদের এই রাজ্য ধরে রাখতে পেরেছিল। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ব্যবিলনীয়রা এই রাজ্যটি শুধু দখলই করেনা, এই রাজ্য থেকেই তাদের উচ্ছেদ করে দেয়। অবশ্য মাত্র বছর পঞ্চাশেক পরেই পারসিকরা জেরুজালেম দখল করে এবং মুসা(আ) এর অনুসারীদের এই অঞ্চলে পুনরায় বসবাসের অনুমতি দেয়। পরবর্তিতে রোমান সাম্রাজ্যের অধিকারে চলে যায় শহরটি। রোমানরা পেগানিজম বা বহু শক্তির পুজারী হওয়া সত্বেও শুধু রোমান সম্রাটকে খোদায়ী প্রতিনিধি হিসেবে মূসা(আ) অনুসারীরা মেনে নেয়ায়, রোমানরা এই একাত্ববাদীদের কোন কর্মেই খুব একটা বাধার সৃষ্টি করেনি। রোমান সম্রাট কে খোদায়ী প্রতিনিধি স্বীকার করাকেও একটি বিচ্যুতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ইতিহাসে।

স্বাভাবিক ভাবেই একাত্ববাদের মূল আদর্শচ্যুত এই অনুসারীদের মাঝে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। এমনকি তাদের উপাসনা কেন্দ্রগুলো হয়ে ওঠে ব্যবসায়ীক ও বিভিন্ন অনাচারের কেন্দ্রবিন্দু। ঠিক এসময়েই আবার একাত্ববাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার জন্য সংস্কারবাদী হিসেবে হযরত ঈসা(আ) আবির্ভাব এবং তিনি প্রথমেই উপসনা স্থল থেকে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করেন। দেখা দিল স্বার্থের সংঘাত, শুরু হল ঈসা(আ) বিরোধী আন্দোলন। তৎকালীণ রোমান শাসকগণ এই আন্দোলন থামাবার লক্ষে ঈসা(আ) কে ক্রুশবিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত দেয় (অনেকের মতে) ৩৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রস্থান ঘটে। এই ঘটনার পর মূসা(আ) এর মূল অনুসারীদের কিছু অংশের মাঝে এবং ঈসা(আ) অনুসারীদের মাঝে রোমান বিরোধী ক্ষোভ ধুমায়ীত হয়ে উঠতে থাকলে রোমান সম্রাট দুটি কাজ করে।
১) যে শাসক ঈসা(আ) কে ক্রুশবিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিল তাকে রোমে ডেকে পাঠিয়ে বিচারের ব্যবস্থা করে এবং
২) হযরত ঈসা(আ) অনুসারীদের মাঝে বিভক্তি নিয়ে আসে। ঈসা(আ) কে ক্রুশবিদ্ধ করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী বিশাল ব্যবসায়ী সেইন্ট পল নামের এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পুরো রোমান সম্রাজ্য জুড়ে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের সুযোগ করে দেয়। আরেকটি উপদল সেইন্ট জেমসের নেতৃত্বে সংস্কারবাদী হিসেবে জেরুজালেমেই থেকে যায়।

কথিত আছে, ৫০ খ্রীস্টাব্দে জেরুজালেমের সেইন্ট জেমস, যিনি সংস্কারবাদী হিসেবে মুসা (আ) প্রবর্তিত ধর্মে পালিত নিয়মকানুনের উপর স্থির থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেইন্ট পল সেটা না করার কারণে সকল সংস্কারবাদীদের(পল সহ) জেরুজালেমে ডেকে একটি আপোষ রফায় পৌঁছেন। ৬৬ খ্রীস্টাব্দে মুসা (আ) অনুসারীদের বিদ্রোহের তোড়ে রোমানরা শুধু জেরুজালেমই নয় সমগ্র জুডা এলাকায় পরাজিত হয় এবং জেরুজালেমকে আবার একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ঘোষনা করা হয়। রোমানদের মত বিশাল শক্তিকে অত্র অঞ্চলে পরাজিত করায় ইহুদীদের প্রচুর ভগ্নাংশের মাঝে আরেকটি ভগ্নাংশ তৈরী হয় যারা বিশ্বাস

করা শুরু যে, সমগ্র পৃথিবীই তাদের শাসনাধীনে থাকবার কথার ভবিষ্যতবাণী তাদের ধর্মে বলা হয়েছে। এটাকেই প্রথম অতি ধর্ম কেন্দ্রীক রাষ্ট্রীয় ভাবনার সূচনা বলা যেতে পারে।

ঐ বিদ্রোহের সূচনা লগ্নেই জেরুজালেমের সংস্কারবাদী নেতা সেইন্ট জেমসকে হত্যা করা হয়। প্রায় একই সময় রোমানদের পৃষ্ঠপোষকতার অধিকারী সেইন্ট পলকেও সম্রাট নীরোর নির্দেশে হত্যা করা হয় রোমে। ৭০ খ্রীস্টাব্দে রোমানরা আবার জেরুজালেম দখল করে এবং ৭৩ খ্রীস্টাব্দের মাঝেই ক্ষন্ডকালীন সময়ের ইতিহাসের প্রথম অতি ধর্মীয় রাষ্ট্রের পতন হয় কিন্তু সমাপ্তি নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের এই অতি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মৌলবাদীরা ঐক্যবদ্ধ চক্রান্ত চালাতে থাকে এবং উনিশ শতকের শেষে এসে সেটা প্রকাশ পায়। চক্রান্তের সংক্ষিপ্ত মূলবাণী অনেকটা এরকম,

১) বিশ্বের সকল দেশের অর্থনীতিকে একটি ছকের মাঝে ফেলে তাদের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসা।
২) অতিমাত্রায় বৈজ্ঞানিক চমক দিয়ে মানুষকে ইহজাগতিক কর্মে ব্যতিব্যাস্ত রাখা।
৩) মানুষের ধর্মীয় Moral, Ethic ভেঙ্গে দেয়া।
৪) বিশ্ব ব্যাপী ধর্মীয় উন্মাদনা অথবা অতি জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়ে এনার্কিজম বা রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা তৈরী করা, যাতে সাধারন মানুষ বর্তমান নেতৃত্বের উপর বিতশ্রদ্ধ হয়ে পরে।
৫) লিবারিজমের নামে গনতান্ত্রিক একটি অংশ গড়ে তোলর যারা পরোক্ষভাবে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করবে।
৬) মিডিয়ার ওপর সম্পুর্ন নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত করা।
৭) বিভিন্ন ধর্মের মাঝে বিভ্রান্তি ও বিভক্তিকে সহায়তা করা এবং জিয়নবাদের সাথে সংঘাতপুর্ন ইতিহাসকে সম্পুর্ন মুছে ফেলে নতুন ইতিহাস লেখা।
৮) অতঃপর একক বিশ্ব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলে সেই একক বিশ্ব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেবে ইত্যাদি।

চক্রান্ত আছে কি নেই সেই বিতর্কে না যেয়ে বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি বিশ্লেষন করলে মনে হবে যেন কোন এক শক্তির অদৃশ্য সূতার টানে উপরে উল্লেখিত মূলবাণীকে চুড়ান্ত রুপ দেয়ার কাজ প্রায় শেষের দিকে। ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত কিছু তথ্য, চার নাম্বার পয়েন্টটি, ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত হিটলারের অতি জাতীয়তাবাদী নাৎসীরা বিশ্ব অর্থনৈতিক ও মিডিয়া সমর্থন পেয়েছিল। আবার ক্যাপিটালিজমের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বলশেভিক বিপ্লবের নায়কেরা প্রাথমিক অবস্থায় বিশ্ব অর্থনৈতিক ও মিডিয়া সহযোগীতা পাওয়ার কারণ বিশ্লেষন ক'রে অনেকেই বলেন, ঐ তথাকথিত চক্রান্তকারীদের প্রতিনিধি বলশেভিকদের মাঝে ছিল এবং যে কারণে রাশিয়ার মত একটি বিশাল রাষ্ট্রের মাঝে এনার্কিজম শুরু হয়ে শেষ না হলেও যেমন ভাল তেমনি শেষ হ'লেও একটি একক সর্বগ্রাসী বলয় রাশিয়ার ক্ষমতায় গেলে ঐ বলয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের মূল এজেন্ডা, অর্থাৎ, সমগ্র পৃথিবী শাসনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে একধাপ এগিয়ে যেতে পারবে।

সাত নাম্বার অংশটির উদাহরণ দেয়া যাক; কোন এক অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে কিছু ইতিহাসবেত্তা আজকাল সকল একাত্ববাদী ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, যেমন, "কিবলা" নিয়ে ভ্রান্তি ছড়াবার লক্ষে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে তারা কিছু অদ্ভুত তথ্য উপাত্য উপস্থাপন ক'রে চলেছেন। তারমাঝে সবচেয়ে হাস্যকর তথ্য, জর্দানের এক অতি পৌরাণিক নগর "পেত্রা" এর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত একটি অর্ধচন্দ্রাকার রেলিক কিন্তু তারা ভুলে যান যে, "হান" সম্প্রদায়ের একটি অংশ পূর্বদিকে আধিপত্য বিস্তার করেছিল খ্রীস্ট জন্মের তিন'শ বছর বা তার পূর্বেই এবং ঐ ধরনের অর্ধচন্দ্রাকার আকৃতি তাদের উপাসনালয়ে ব্যবহৃত হত, প্রাপ্ত রেলিকের অসামঞ্জস্য কেন যেন তাদের নজরেই পরেনা।

এই পয়েন্ট গুলোর শেষ অংশটি "একক বিশ্ব ব্যবস্থা" আমার খুব প্রিয়। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে

এটা অবশ্য প্রয়োজনীয় কিন্তু কোন ভয়ংকর পরিকল্পনা এড়িয়ে, যে কোন কুচক্রী মহলকে এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার নেতৃত্বের বাইরে রেখে সেটা অর্জন করা সম্ভব কি?

সুসম বিশ্বরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে শীতল যুদ্ধের কারণে বিশ্ব ব্যবস্থায় চেক এন্ড ব্যালেন্সের একটি ভারসাম্য থাকার কারণে চক্রান্তকারীদের ওপরে উল্লেখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি অদৃশ্য প্রাচীর তৈরী হয়েছিল। বর্তমানে আবার একটি একক নিয়ন্ত্রনাধীন ব্যবস্থা গড়ে ওঠায়, এই একক নিয়ন্ত্রনের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে একটি একক বিশ্ব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষে তারা এগিয়ে যেতে চাইছে। যে কারণে আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাঠামোর মাঝে চরম পন্থীদের উত্থান থেকে শুরু করে অতি জাতীয়তাবাদী প্রভাব খুঁযে পাবো। তারসাথে আছে পরিকল্পিত ভাবে তৈরী করা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দূর্গতি।

পরিকল্পনা আর ষড়যন্ত্রের পার্থক্য করা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়। একই বিষয় কারো কাছে পরিকল্পনা এবং কারো কাছে ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। ওপরের পরিকল্পনা, যেটাকে অনেকেই ম্যাকিভিয়েলের ও হারম্যান গডসের কিছু লেখা থেকে তৈরী করা একটি ষড়যন্ত্র তত্ব বলে থাকেন, সেটা পরিকল্পনা নাকি ষড়যন্ত্র তা নিয়ে না ভেবে বরং আমরা খোঁজার চেষ্টা করি আমাদের বর্তমান সভ্যতার জন্য ভাল কোনটা। বিশেষত, পরিকল্পনাই হোক আর ষড়যন্ত্র তত্বই হোক কিংবা এই তত্বের কোন অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক, অদৃশ্য কোন কিছুকে সরাসরি আঘাত না করে বরং এটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার একটা পরিকল্পনা ক'রে বিশ্ব ইতিহাসকে ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেয়াটা অনেক যুক্তিযুক্ত।

সেই সূত্র ধরে এগিয়ে যাবার লক্ষে, তথাকথিত পরিকল্পনা থেকে "অতি" অংশটিকে যদি বাদ দিলে হয়তো বর্তমান সভ্যতাকে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, যেমন, রাষ্ট্রের স্বার্থে মিডিয়া নিয়ন্ত্রন প্রয়োজন আছে কিন্ত অতি নিয়ন্ত্রন করতে যেয়ে কোন একটি গোষ্ঠির চুড়ান্ত নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত করতে দেয়া নয়, জাতীয়তাবাদ অবশ্যই প্রয়োজনীয় কিন্ত অতিজাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারনা নয়, ধর্মীয় Moral অবশ্যই প্রয়োজনীয় কিন্ত মূল ধর্মীয় Ethic এর সাথে সামঞ্জস্যহীন উন্মাদনা বা চরমপন্থী ধ্যান ধারনাকে প্রশ্রয় দেয়া নয়, বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যা করণীয় সেটা করা প্রয়োজন কিন্ত বিজ্ঞানকে নিয়ে কোন ধোঁয়াশা তৈরী না ক'রে বিজ্ঞানকে সর্বসম্মুখে প্রকাশিত অবস্থায় রেখে শুধু মানব কল্যানে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা নেয়া এবং রাষ্ট্রের মৌলিক শক্তি, অর্থনীতি-রাজনীতি-সামরিক শক্তিকে একটি সুবিন্যস্ত সুসম কাঠামোর মধ্যে আনা ইত্যাদি।

রাষ্ট্রের মৌলিক শক্তি

আদী যুগ থেকেই রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করেছে অর্থনীতি এবং সেই অর্থনীতিকে এগিয়ে নেবার জন্য জনমতকে সংগঠিত অবস্থায় রাখার জন্য প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক অবকাঠামো ও সামরিক শক্তির সমর্থন। অর্থনীতি-রাজনীতি-সামরিক শক্তিকে রাষ্ট্রের মৌলিক শক্তি না বলে প্রাথমিক মৌলিক শক্তি বলা শ্রেয়। একটি উক্তি অনেকটা এরকম, কোন গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়ক যদি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার সময় পেছনে তাকিয়ে দেখেন যে, তার পেছনে কোন মানুষ নেই তখন আর রাষ্ট্রও থাকে না, নায়কও থাকে না। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তির দায়ীত্ব হল, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের জনশক্তির মাঝে আদর্শিক একটি অভিন্ন জাতীয়তাবাদী ঐক্য তৈরী করা। অর্থনীতি-রাজনীতি-সামরিক শক্তি নামের এই মৌলিক শক্তি সমুহের সাথে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুক্ত হয়েছে টেকনোলজির উন্নয়ন। প্রথমে চলে আসি অর্থনীতির কাছে।

অর্থনীতি এক দুর্বোধ্য বিষয়, তবে অবিশেষজ্ঞ মানুষ হিসেবে সাদা চোখে বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিত বিশ্লেষণ করার জন্য সাধারণ মানুষের ভাবনা হিসেবে কিছু কথা বলা যেতেই পারে। আগামীদিনের বিশ্ব অর্থনীতিতে টেকনোলজি, সাইবার কারেন্সি বা ক্রিপ্টো কারেন্সি, ডিজিটাল কারেন্সীর ভূমিকা কি হতে পারে সেটা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সামরিক শক্তির বলয় নির্ধারনে নিত্য নতুন টেকনোলজির উদ্ভাবনে কখন কোনদিকে সামরিক শক্তির পাল্লা ভারী হয় সেটা বুঝে ওঠা কষ্টসাধ্য। টেকনোলজির উন্নয়ন এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, ইন্টারনেট এখন শুধু কোন তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যম নয়, যুদ্ধাস্ত্রও বটে। সাইবার ওয়ারফেয়ারের সক্ষমতা আগামী দিনের সামরিক ভারসাম্যে এক বিরাট ভূমিকা রাখবে।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক হুয়াওয়ের বিরুদ্ধে নেয়া ঘটনায় আরেকটি সন্দেহ আরও ঘণীভুত হয় যে, আগামীদিনের সাইবার যুদ্ধে রক্ষণাত্মক কৌশলের কারণে হলেও ইন্টারনেট প্রোটকল গুলোর যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাশিয়ান, চৈনিক, ইউরোপীয়ান ইত্যাদী ভাগে বিভক্ত হয়ে পরার সম্ভবনা আছে। হুয়াওয়ের ঘটনা আরেকটি ভাবনার দুয়ারও খুলে দেয়, যদি কোন কারণে আগামীতে বিশ্ব শক্তি সমুহ বিভিন্ন ভর কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পরে, তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় যেন যুক্তরাষ্ট্রের টেকনিকাল অগ্রাধিকার থাকে। তাহলে কি ধরে নেয়া যায়, যুক্তরাষ্ট্র খুব তাড়াতাড়িই তার একমাত্র বৈশ্বিক পরাশক্তির অবস্থান থেকে সরে আসতে চাইছে? আমি অবশ্য বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্রের কোন তাড়া নেই। ২০২১ সালে নতুন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা গ্রহন না করা পর্যন্ত যা কিছুই এখন ঘটছে সবই, "যত গর্জে তত বর্ষে না" ধরনের কর্ম।

চীনের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির উত্থানে বহু মানুষই আজ চমকিত, আশ্চর্যান্বিত, আবেগাপ্লুত হয়ে ভাবছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান এবং চীন আগামী। কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, রাশিয়ার বিপক্ষের বলয় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট চীন। ভবিষ্যতে যদি কোন কারণে চীন তার নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পরে তবে চীনকে নিয়ন্ত্রনে রাখা যাবে কিনা সেটা বোঝার চেষ্টাতেই বর্তমান বানিজ্য যুদ্ধ এবং এই বানিজ্য যুদ্ধের মধ্য দিয়ে চীনের আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক শক্তির বিচার করার একটি নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা মাত্র। তবে চীন অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। একমাত্র জ্বালানী ছাড়া বর্তমান বৈশ্বিক সকল প্রকার মৌলিক শক্তির বিচারে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র বলার সাহস রাখে যে, আমি একাই একশো।

চীন-রাশিয়ার ঐক্যের ভবিষ্যত সম্ভবতা যাচাই করার সম্ভবনা কেন আলোচনায় এলো? বিশেষত চীন রাশিয়া প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও যেখানে মৈত্রী বন্ধন ইতিহাসের পাতায় খুব একটা দৃশ্যমান নয় বরং মঙ্গোলদের যদি চৈনিক বংশদ্ভুত হিসেবে ধরা যায় তবে তো রাশিয়া একটা সময় পর্যন্ত চীনের শত্রুই ছিল। বর্তমানে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া চীন রাশিয়ার বর্তমান সুদৃঢ় ঐক্য ও সহযোগীতাকে বাঁকা চোখে দেখার চেষ্টায় বলার চেষ্টা করছে যে, চীন তার নিজস্ব অর্থনীতির পরিচালন শক্তির জ্বালানী স্টেশন হিসেবে রাশিয়াকে ব্যবহার করছে কিন্তু চীন এই জ্বালানী ও রসদ মূলত রাশিয়ার জন্য দূর্গম এলাকা সাইবেরীয়া থেকে সংগ্রহ করায়, চীন বা রাশিয়ার কোন পক্ষেরই এতে কোন দোষের কিছু দেখতে পাবার কারণ নাই।

একক কর্তৃত্ব ও অতি জাতীয়তাবাদ

বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চীনের মতই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি জাপানও যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী। যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তা নির্ভর অর্থনৈতিক অবস্থান এতোই বৃহৎ যে, তার সামান্য অঙ্গুলি হেলনে চীন, জাপানের মত অর্থনৈতিক অবস্থান গড়ে ওঠার জন্য এক যুগের বেশী সময়ের প্রয়োজন নেই। সেই হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রভাব বলয়ের বিষয়ে কোন পক্ষেরই তেমন কোন অনাগ্রহ থাকবার কথা নয় কিন্তু তারপরও বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্র তত্বের ভয়, অর্থাৎ, যদি কোনদিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতায় কোন এক স্বৈরাচার তার অবস্থান নিশ্চিত করে ফেলতে পারে তবে জাতিসংঘ কে একটি পুতুল আন্তর্জাতিক

প্রতিষ্ঠানে পরিনত ক'রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল অর্থনৈতিক ও সামারিক শক্তির প্রভাবে সমগ্র বিশ্বকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠন একক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ার ষড়যন্ত্র তত্ব বাস্তবায়নের লক্ষে প্রথম ধাপ কিনা সেটা নিয়ে বিতর্কের চেয়ে আগে মেনে নিতে হবে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের বাস্তবতা। এটা সম্ভব হয়েছে আসলে বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইউরোপের রাষ্ট্র সমুহের একক ভূমিকা রাখার সক্ষমতা নিয়ে তাদের নিজেদের সন্দেহ থাকার কারণে। রোমান সাম্রাজ্যের 'আমি রোমান নাগরিক" পরিচয়ে যে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক উচ্চতর অবস্থানের অহমিকা প্রকাশ করা হ'ত, সেই অতি জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারনার বশবর্তি হয়ে পৃথিবীর বুকে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চাইতে অংশীদারী কর্তৃত্ব পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার স্থায়ীত্ব প্রলম্বিত করার জন্য একটি ভাল পদক্ষেপ সেটা তাদের বোধের বাইরে নয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োজন আছে এটি যেমন সত্য তেমনি সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির স্থিতিস্থাপকতাও অসীম নয়। একটা সময় আসে যখন সামরিক শক্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্বেতহস্তী সম হ'য়ে পরে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান একক সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের শ্বেতহস্তী বহন করার ক্ষমতা কতদিন থাকতে পারে? পারমানবিক অস্ত্র আসবার পর রাষ্ট্রের মৌলিক শক্তি হিসেবে যদি আমরা সামরিক শক্তিকে বেশী প্রাধান্য দিতে চাই তবে মানব সভ্যতাকে বাষ্পে বিলীন করবার ক্ষমতা বেশ কিছু রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে। এই পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করা বা ডেলিভারি সিস্টেমের সক্ষমতার উপর নির্ভর ক'রে মানব সভ্যতা বিলীন করবার মত শক্তি সমুহকে আমরা মোট চার ভাগে ভাগ করতে পারি,
১) যুক্তরাষ্ট্র ২) রাশিয়া ৩) ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ৪) চীন।

বৃটেনের ব্রেক্সিটের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সক্ষমতা হ্রাস পেলেও সার্বিক ভাবে ফ্রান্স ও জার্মানী নির্ভর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সক্ষমতাকে খাটো করে দেখবার কোন অবকাশ নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বৃটেনের পৃথক হবার কারণ হিসেবে বহু মত রয়েছে। যেমন, ভবিষ্যতে যদি বিশ্ব বিভিন্ন শক্তি বলয়ে বিভক্ত হ'য়ে পরে তবে বেশ কিছু রাষ্ট্র একটি নিউট্রাল বলয় হিসেবে থাকতে চাইবে, সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ভাবাপন্ন বৃটেনকে দিয়ে পৃথক একটি নিরপেক্ষ বলয় তৈরী করা। বৃটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক বা সামরিক শক্তি কোনটিই এই তত্বকে যুক্তিসঙ্গত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না বরং সর্বক্ষেত্রে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পারিক সমঝোতা কোন গোপন বিষয় না হবার কারণে বৃটেনের নেতৃত্বে কোন নিরপেক্ষ বলয় মেনে নেয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

বর্তমানে বৃটিশ রাজনৈতিক নেতাদের আরেকটি খুব প্রিয় তত্ব, "সিঙ্গাপুর তত্ব", অর্থাৎ, বৃটিশরা ট্যাক্সের স্বর্গরাজ্য তৈরী ক'রে মানি লন্ডারিং কে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে ইউরোপ সহ বিশ্বের মূলধন সহ সকল কালোটাকা কে বৃটেনমূখী করে তুলে ইউরোপীয় ইউনিয়েনের শক্তি হ্রাস করা। এই কাজে তারা ঐতিহাসিক ভাবে সিদ্ধহস্ত। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে তারা তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বারমুদা, কেমেন আইল্যান্ড, বৃটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড সহ সাতটি দ্বীপে এই ধরনের অফশোর ব্যবস্থা ব্যবহার করে। সেই সূত্রে দ্বীপ গুলোতে চলমান সকল অর্থনৈতিক অপরাধ মুলক কর্মকান্ডে নিজের দায়ীত্ব অস্বীকার ক'রে অভূতপূর্ব সাফাল্য অর্জন করেছিল এবং এখনও বিশ্বাস করা হয় যে, পৃথিবীর তাবৎ কালো টাকার অর্ধেক নিয়ন্ত্রক বৃটেন, যার পরিমান পঞ্চাশ ট্রিলিয়ন ডলার হবার সম্ভবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

বিভক্ত বিশ্ব বলয় ব্যবস্থায় এই কালোটাকা গুলোকে যদি তাদের অর্থনীতিতে ফিরিয়ে আনতে চায় এবং ভবিষ্যতের কালোটাকার বাজারকে যদি তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তবে তাদের নিজেদের দেশে একই ধরনের

একটি বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্ট ক'রে অফশোর ব্যাংক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে একই কাজ করা প্রায় অসম্ভব বেশ কয়েকটি কারণে, প্রথমত, উন্নত ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, এবার এই কাজে তার নিজের দ্বীপ ব্যবহার করতে হবে, যে কারণে এই ধরনের অপরাধী কর্মকান্ড কে সে অস্বীকার করতে পারবে না। সর্বোপরি, ইউরোপের সাথে আলোচনা না ক'রে, ইউরোপের নাকের ডগার উপর বসে, ইউরোপের বিরুদ্ধে এই তত্ব প্রয়োগ করা অসম্ভব।

স্বর্ণ-কারেন্সি-অর্থনৈতিক আধিপত্যের ভয়

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাথমিক অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র প্রায় তিন বছর যোগ না দিয়ে যুদ্ধের মূল যোগানদারের ভূমিকা নিয়ে, বিশ্ব বানিজ্যের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সকল অর্থনৈতিক মাধ্যম সেই সময়ের ক্রস বর্ডার বা আন্তসীমান্ত বানিজ্যে অকার্যকর হয়ে পরায়, স্বর্ণ ছিল এই বানিজ্যের একমাত্র মাধ্যম। যে কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণের মজুদ প্রায় পৃথিবীর তাবদ স্বর্ণের অর্ধেক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেটা দাঁড়িয়েছিল দুই তৃতীয়াংশ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কোরীয়ান যুদ্ধে ও ভিয়েতনাম যুদ্ধে সরাসরি সম্পৃক্ততার কারণে, ঐ যুদ্ধগুলোর পর যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ব অর্থনৈতিক একক ব্যবস্থাপনা থেকে ঘোষনা দিয়ে সরিয়ে আনতে হয়েছিল। আফগানিস্তান ও ইরাকে যদিও জাতিসংঘের আবরণ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ করেছিল, তারপরও এটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রেরই যুদ্ধ এবং সে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চাপের মুখে পরেছে সেটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্র ভাল ভাবেই উপলব্ধি করে। সুতরাং, বিশ্ব যদি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে যেয়ে না দাঁড়ায় তবে নিকট ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র কোন যুদ্ধে সরাসরি নিজেকে যুক্ত করবে বলে মনে হয় না।

পাগল ছাড়া বিশ্বসভ্যতা ধংসের পেছনে কোন মানুষ ভূমিকা রাখতে পারে না। সুতরাং, সামরিক শক্তি প্রয়োগে সমস্যার সমাধান খোঁজার বোকামী বর্তমান পরাশক্তি গুলো করবে না। তাহলে হাতে রইলো অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনে জয়ী হবার চেষ্টা, যেখানে স্বর্ণ একটি বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। সেই আদীকাল থেকেই শুধু আন্তর্জাতিক বানিজ্যেই নয়, আভন্তরীন লেনদেনেও স্বর্ণের একক ভূমিকার কারণ বোঝা দুষ্কর। গহনা ছাড়া স্বর্ণের অন্য কোন ব্যবহার না থাকা সত্বেও শুধু টেকসই এবং দুস্প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে স্বর্ণ তার এই অবস্থান গড়ে নিয়েছে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক, কোন একটি রাষ্ট্র এমন একটি গাছ পেয়ে গেল যার পাতা গুলো হাজার হাজার বছরেও নষ্ট হবে না। ব্যাস, রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিল, এই গাছ যে বাড়িতে পাওয়া যাবে তাকে নির্বংশ করা হবে এবং শুধুমাত্র রাষ্ট্রের তত্বাবধানে, রাষ্ট্রই শুধু এই গাছ রোপন করতে পারবে এবং এর পাতাই হবে সকল বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম। সাধারন মানুষও রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তার কারণে আস্থা পেল ঐ পাতার ওপর এবং তৈরী হল টাকার গাছ স্বর্ণ এবং উদ্ভাবিত হল ফিয়াট কারেন্সী, অর্থাৎ, প্রতিটি দেশের কাগুজে টাকা। ফিয়াট কারেন্সী আর স্বর্ণ, এই দু'টোই সত্যিকার অর্থে বায়বীয়, অর্থাৎ, মানুষের আস্থা আছে তাই এর অস্তিত্ব টিকে আছে।

এখন দেখা যাক বিশ্বের স্বর্ণ নামের টাকার গাছ গুলো বর্তমানে কোথায় আছে। পৃথিবীর প্রায় তাবৎ স্বর্ণ খনি মূলত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া আফ্রিকার কয়েকটি দেশে অবস্থিত। বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের কোষাগারের স্বর্ণ মজুদের পরিমান ৩৩,০০০ হাজার টন, ব্যক্তিগত মজুদ আছে প্রায় দেড় লক্ষ টন এবং বিশ্বের প্রতি বছর স্বর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২০০০ টন। হিসেবের সুবিধার্থে আমরা বর্তমান স্বর্ণ মুল্য ধরে নেই কেজি প্রতি ৪০,০০০ ইউএস ডলার, অর্থাৎ, এক টনের দাম প্রায় চার কোটি ইউ এস ডলার এবং সর্বমোট রাষ্ট্রীয় মজুদ মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ কোটি ইউ এস ডলার। যদি স্বর্ণ নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা থাকতো তবে এটাই হবার কথা ছিল আমাদের বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতির পরিমান। কিন্তু যেহেতু আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় গাছের পাতা ডলারের প্রতি আমাদের আস্থা রাখতে পেরেছি, সে কারণে আমরা আমাদের বৈশ্বিক

অর্থনীতিকে এর প্রায় পাঁচ গুন করে ফেলেছি এবং যেহেতু খনিজ জ্বালানী প্রয়োজনীয় তাই এই অর্থনীতির সাথে যুক্ত হয়েছে জ্বালানী বিষয়ক আরও প্রায় এক গুনিতক। সাথে কালো টাকার অস্তিত্ব তো আছেই।

আমাদের বর্তমান ডলার নামক গাছের পাতার অর্থনীতি থেকে পুনরায় স্বর্ণ নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমস্যা হল, আমাদের বৈশ্বিক অর্থনীতি স্বর্ণ তুলনায় প্রায় ছয় গুণ স্ফীত অবস্থায় আছে। তাহলে বিশ্ব অর্থনীতিতে আস্থার সংকট কেন দেখা দিচ্ছে না? কারণ আর কিছুইনা, আমাদের মত সাধারন মানুষের স্বর্ণ প্রেম। যেখানে রাষ্ট্রের কাছে আছে ৩৩০০০ টন সেখানে সাধারন মানুষের কাছে আলস পরে আছে আরও প্রায় দেড় লক্ষ টন। যখনই মুদ্রার সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয় তখনই ট্রেজারী বন্ড, স্বর্ণ কেনা বেচা, রেপো-রিভার্স রেপোর মাধ্যমে রাষ্ট্র মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রন করে। তবে স্বর্ণকে বৈশ্বিক মুদ্রার বেইজ লাইন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার আগে অর্থনীতির এই ছয় গুনিতক ফাঁককে অর্ধেকের কাছাকাছি নামিয়ে আনার লক্ষে স্বর্ণ মুল্যকে প্রায় তিনগুন বাড়াতে হবে।

বিশ্ব ধ্বংস করার সক্ষমতা আছে এমন চার পরাশক্তির মাঝে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া জ্বালানী রফতানীকারক দেশ। বাকি রইলো শুধু ইউরোপ এবং চীন। অর্থাৎ, বিশ্বে এই মুহূর্তে যে আট ট্রিলিয়ন পেট্রো ডলার অলস পরে আছে সেটা এখন শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের জন্য বিশাল মাথাব্যাথা এবং সেখান থেকে উদ্ধারের সম্ভবনা নিহিত আছে ইউরোপ ও চীনের মাধ্যমে। সমস্যার শেষ এখানেই নয় বরং বলা চলে শুরু। ইনফ্লেশন-ডিফ্লেশন, চাহিদা-প্রাপ্যতা, মুদ্রানীতির ভূমিকা ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রন সহ অর্থনৈতিক জটিলতা নিয়ে আলোচনা এই লেখার জন্য অপ্রাসঙ্গিক। জিম্বাবুয়ের মুদ্রার একবছরে ১০০ বিলিয়ন গুন পতনের পর অর্থনীতি সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে চলে গিয়েছে। তবে ক্রস বর্ডার ট্রেড বা আন্তসীমান্ত বানিজ্যে স্বর্ণ নির্ভরতার আর প্রয়োজন আছে কিনা সেটা আলোচনা করা যেতে পারে।

সাইবার অর্থনীতি

বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ক্রেডিট কার্ড প্রবর্তিত হওয়াটাকে নতুন অর্থনৈতিক যুগের শুরু বলা যেতে পারে। এরপর নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই যুক্ত হয় ডিজিটাল কারেন্সী। তবে এসব কিছুরই মেরুদন্ড হিসেবে ছিল হয় গাছের পাতা বা ফিয়াট কারেন্সী এবং/অথবা অর্থনীতির সেই অতি পুরাতন মাধ্যম স্বর্ণ। গত শতাব্দীর শেষ দিকে ইলেক্ট্রনিক অর্থব্যবস্থাপনার যুগের কারণে ফিয়াট কারেন্সীর বাস্তব উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা কমে না এলে আট ট্রিলিয়ন অলস পেট্রোডলার সহ যে অর্থনৈতিক স্ফীতি দেখা দিত সেটার পরিমান বর্তমান অবস্থার প্রায় দ্বিগুন হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। অর্থাৎ, টাকা লেনদেনের জন্য টাকার প্রয়োজন রইলোনা, হাওয়া থেকে পাওয়া টাকা গুলো এক ডিজিটাল লেজারবুক থেকে আরেক ডিজিটাল লেজারবুকে চলাচলের কারণে টাকাকে এনে দিল অবাধ স্বাধীনতা, বিশ্ব অর্থনীতিতে বিপ্লব এলো।

ডিজিটাল যুগের নতুন যাদু ক্রিপ্টো কারেন্সীর যুগ শুরু হয় এই শতাব্দীতেই ২০০৯ সালে বিট কয়েনের মাধ্যমে। এই বিটকয়েনের সাফল্যে আরও হাজারো ক্রিপ্টো কারেন্সী চলে এলো অল্প দিনেই। সমস্যা হল, মানুষ এটাকে গ্রহন করলো কেন সেটা এখনো বোধগম্য নয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনের বাইরে এতো বড় একটা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য এতো কম সময়ে গড়ে উঠলো শুধুমাত্র সাধারন মানুষের অস্বাভাবিক আস্থার কারণে। বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল। ২০১৮ সালে ভেনেজুয়েলা তাদের অর্থনীতিকে সামাল দিতে যেয়ে রাষ্ট্রীয় ক্রিপ্টো কারেন্সী "পেট্রা" কে বাজারে ছাড়ার পর আরও বেশ কিছু দেশ আরও কিছু ক্রিপ্টো কারেন্সীকে রাষ্ট্রীয় সমর্থন দেবার কারণে এটা এখন স্থায়ী আসন পোক্ত করতে চাইছে। এমনকি IMF থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাংক সহ অনেকেই এখন এবিষয়ে মাথা ঘামাতে বাধ্য হচ্ছে। শুধুমাত্র মানুষের আস্থার কারণে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শেষ পরিনতি কি হবে সেটা দেখার জন্য বোধহয় আমাদের খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে না।

ক্রস বর্ডার বানিজ্য এই মুহূর্তে সম্পুর্ণটাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সাইবার নেতৃত্বের ব্যবস্থাপনায় বেলজিয়াম কেন্দ্রীক "সুইফট কোড" দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তবে পাশাপাশি ভবিষ্যৎ বিশ্ব বানিজ্যের বিশৃঙ্খলাকে মাথায় রেখেই হোক আর অন্য যে কোন কারনেই হোক চীন, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের নিজেদের সিস্টেম তৈরী করেই রেখেছে।

একক বিশ্ব ব্যবস্থা

সামরিক শক্তির বিশ্বকে চারটি সামরিক বলয়ে ভাগ করার যুক্তিযুক্ততা প্রমানীত। যদি কোন পরিকল্পনাকারী বা চক্রান্তকারী পক্ষ একক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলে তার ওপর লাঠি ঘোরানোর পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র করেই তবে সামরিক চারটি বলয়ের চারটির ওপরেই তাদের আধিপত্য কায়েম করতে হবে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষন দিয়ে আর ভারাক্রান্ত না করে আমরা ধরেই নেই যে, পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকলে তবেই তো অর্থনীতির প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তি বিশ্লেষনকে ভাগ করবার সময়ও আমরা চার সামরিক শক্তিকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করবো। কারণ, সামরিক শক্তি ছাড়া নিজের বাড়ির টাকার গাছও রক্ষা করা অসম্ভব। যেমন, প্রতি বছর অন্তত একটন স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশ আছে বিশ্বে ৬২টি। তার মাঝে ৪০টি দেশ আছে যারা দশটন, ২০টি আছে যারা প্রায় পঞ্চাশটন, ১০/১২টি দেশ আছে যারা ১০০টনের উপর উৎপাদন করে। তালিকার প্রথমেই ৪৩০টন নিয়ে চীন থাকলেও প্রথম ১০/১২টি দেশের মাঝে পেরু, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, মৌরিতানিয়া, পাপুয়া নিউগিনির মত দেশও আছে এবং চীন-রাশিয়া ছাড়া বাকি অন্যান্য স্বর্ণ খনি সমৃদ্ধ বেশীরভাগ দেশ গুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রভাব প্রবল।

সর্বমোট দেশীয় পন্য ও সেবার তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সবার উপরে থাকলেও খুব কাছাকাছি আছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং চীন। মোট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে আনবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ, বর্তমান বিশ্বের টাকার গাছের মৌলিক উপাদান ইউএস ডলার তার নিজের বাগানের গাছ। সেক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ হিসেবে থাকা প্রায় দুই ট্রিলিয়ন ডলার সহ প্রথম অবস্থানে আছে চীন, দ্বিতীয় অবস্থানে জাপান এবং এরপরে আছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। অর্থনীতির বিচারে রাশিয়ার নেতৃত্বে কোন বলয় গড়ে তোলা রাশিয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রায় অসম্ভব। রাশিয়াকে অবশ্যই একটি বলয়ের আস্থা অর্জন করতে হবে। চীন-রাশিয়ার ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তৈরীই আছে। বাকি রইলো, তেল, স্বর্ণ, খনিজে ভরপুর আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়া ওশেনিয়ার দেশ সমুহ(অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি)।

আমার ধারনা, নিজস্ব বলয়ের আন্তরাষ্ট্রীয় বানিজ্যে স্বর্ণ বা কোন ফিয়াট কারেন্সী নয়, প্রাধান্য পাবে সেই অতি প্রাচীন পদ্ধতি, অর্থাৎ, কোন একক মুল্য নির্ধারন পদ্ধতি নয় বরং ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাইয়ের উপর ভিত্তি করে সেই প্রাচীন যুগের বার্টার ট্রেড বা বিনিময় বানিজ্য মাধ্যম। সেই হিসেবে একটা শক্তিশালী অবস্থান তৈরী করেছে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন বলয় ব্রিক্স। এমতাবস্থায় বিশ্ব ব্যবস্থার একটি ভবিষ্যত কাঠামো তৈরী করা গেলেও সবচেয়ে বিপদে পরতে হবে সৌদি আরবকে নিয়ে। কারণ, তার অবস্থান থাকবে ব্রিক্সের হৃদপিন্ডে অথচ ঐতিহাসিক ভাবে সে থাকতে চাইবে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ইউরোপীয় প্রভাব বলয়ে কিন্তু ভবিষ্যৎ বলয়ের রাষ্ট্র সমুহের আন্তসীমান্ত বানিজ্যের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থায় বর্তমান জ্বালানী তেলের মূল ক্রেতা চীন চাইবে তাকে ব্রিক্স মুদ্রা বলয়ে রাখতে।

এবার আমরা সামরিক শক্তির চারটি বলয়কে অর্থনৈতিক বিচারে তিনটিতে নামিয়ে এনে বিশ্বকে তিন ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করি,

১) পানামার পর থেকে উত্তরের রাষ্ট্র সমুহ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রভাব বলয়। এখানে শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন যুক্ত হতে পারে।
২) ফিলিপাইন থেকে শুরু করে এশিয়া ওশেনিয়া এবং জাপান কে ইউরোপীয় বলয়ে ঠেলে দিলে সমস্যার কিছুটা সমাধান আসবে; চীন-রাশিয়া তাদের বাড়ির পাশে ইউরোপের উপস্থিতি মেনে নিতেও পারে। এই বলয়ে আরও কিছু দেশকে যুক্ত না করলে যুক্তরাষ্ট্রের আস্থা আসবে না। যেমন পেরু, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া সহ দক্ষিণ আমেরিকার উপরের অংশ (পানামা পর্যন্ত), মরক্কো থেকে শুরু করে মিসর পর্যন্ত আফ্রিকার উপরের অংশ ও জিসিসি ভুক্ত দেশের কিছু অংশ।
৩) বাকি সব রাষ্ট্র ব্রিক্স প্রভাব বলয়। জিসিসি দেশ সমুহের অন্তত একটি অংশ এবং তুরস্ক এই বলয়েই থাকতে চাইবে।

একটি সিদ্ধান্তে এখন বোধহয় উপনীত হওয়া যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিপুঞ্জ যেভাবে বিলিন হ'য়ে গিয়েছিল একই ভাবে বিশ্বের আগামী সংকটে জাতিসংঘ বিলুপ্ত না হবার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টকর। এবং আরেকটি সিদ্ধান্তও নেয়া যেতে পারে, বিশ্ব একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে, আর সকল পরিবর্তন হবে সেই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর, ধরে নেই ২১ সালে বা তার পরেই।

চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ

বিশ্ব ইতিহাসের প্রতিটি যুগান্তকারী দিক পরিবর্তনের পূর্বে একটি প্রলয়ংকরী যুদ্ধ বা বিপর্যয় এসেছে। একটি ভবিষ্যতবাণী অনেকটা এরকম, চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্র হবে ইট-পাটকেল ও আদীম অস্ত্রাদী। সর্বব্যাপী মারত্মক মানবসভ্যতা বিধ্বংসী অস্ত্রের প্রয়োগের মাঝ দিয়ে কোন তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ তো নয়ই বরং আমার বিশ্বাস, আঞ্চলিক ছোট খাট দু'য়েকটা সংঘর্স ধরনের কিছু ঘটলে ঘটতে পারে। কারণ, বিশ্বকে যারা একক বিশ্ব বানাতে চাইছে তারা যত নির্দয়ই হোক না কেন, সভ্যতা ধ্বংসের দায়ীত্ব কেউ নেবে না। । তবে সভ্যতা বিধ্বংসী অস্ত্র প্রয়োগ না করে, অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে বহু আগেই। এই যুদ্ধে যতজন না সৈনিক মারা যাচ্ছে তার চেয়ে বেশী মারা যাচ্ছে মানবতা। আগামী বিশ্বের বলয় নির্ধারণে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করা ও স্নায়ুর চাপকে কে কতটুকু সহ্য করতে পারে সেটার পরিমাপ করার চেষ্টায় মানবতার নাভিশ্বাস উঠানো এই যুদ্ধযুদ্ধ খেলার চুড়ান্ত পরিনতির জন্য আমাদের খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

বর্তমানের এই যুদ্ধযুদ্ধ খেলায় আরেকটি ধারনা প্রবল যে, বিশ্ব সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি মঞ্চে চীনের বলিষ্ঠ আবির্ভাব কোন চক্রান্তকারী বা পরিকল্পনাকারীর হিসেবের মাঝে না থাকায়, তাদের গুছিয়ে আনা এবং প্রায় ঘাটে ভিড়তে যাওয়া তরীটির হঠাৎ ঝাঁকুনি তাদের কিছুটা হলেও হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। সেই বিহ্বল অবস্থায় সব কিছুই বিষধর মনে হয় তাদের। যেমন,
১) কৃষ্ণ সাগর ২) বাল্টিক সাগর ৩) ভূমধ্য সাগর ৪) পারস্য উপসাগর ৫) সুয়েজ ও লোহিত সাগর ৬) পানামা খাল ৭) প্রশান্ত মহাসাগর ৮) উত্তর ও দক্ষিণ আটলান্টিক ৯) দক্ষিণ চৈনিক সাগর সহ কয়েকটি পানিপথের উপর প্রভাব বিস্তার বা অন্য পক্ষের প্রভাব বিস্তারের ভয়ের গুরুত্ব বোঝার জন্য সুয়েজ ক্যানেলের ইতিহাসই যথেষ্ঠ। ১৯৫৬ সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের যখন সুয়েজকে জাতীয়করণ করলেন তখন বৃটেন ও ফ্রান্স রীতিমত যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে মিসরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্ত যুক্তরাষ্ট্র ঠিকই বুঝেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় সামরিক শক্তির তৎকালীন খর্বাকৃতি অবস্থার মাঝেই সুয়েজের ওপর যদি ইউরোপীয় শক্তির দখলদারিত্বের ইতি টানা যায়, তবে বিশ্বশক্তি মঞ্চে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ফ্রান্স, বৃটেনকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল, বাকিটুকু ইতিহাস।

সেদিন রাস্তায় যেতে যেতে একটি স্লোগান দেখলাম,
“একটি দুর্ঘটনা
একটি পরিবারের কান্না”, দারুন একটি স্লোগান কিন্তু হৃদয়াঙ্গম করা সম্ভব কি। লেখার শুরুতে আমার যে খালাতো বোনের কথা বলেছিলাম তার মৃত্যু অবশ্যই তার পরিবারের জন্য বেদনাদায়ক কিন্তু পরিবারের বাইরে যারা আছে, যেমন আমার মত এক্সটেন্ডেড পরিবার, যার মনন, Moral গঠনে ছিল তাঁর অপিরিসীম ভূমিকা, তাদের কথা রয়ে যায় দৃষ্টির আড়ালেই। অথচ একটি যুদ্ধ তো শুধু একটি বুলেট, একটি মৃত্যু এবং একটি পরিবারের কান্নার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে ওঠে হাজারো বা লাখো মৃত্যু ও যন্ত্রনার এবং একটি রাষ্ট্রের সার্বিক অন্তরক্তক্ষরণের কারণ। কিন্তু রাষ্ট্রের কি সেটাতে কিছু আসে যায়? অন্তত আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় না। যুদ্ধের কারণে পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় নতুন মানচিত্র, রাষ্ট্র আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়, আবারও রাষ্ট্র নায়ক বা খলনায়কেরা নতুন বুলি নিয়ে হাজির হয়, সাধারন মানুষেরা আবারও ভুলে যায় ইতিহাস, আবারও তৈরী হয় হাজারো মানুষের কান্না।
সভ্যতা বিধ্বংসী পারমানবিক বোমার ব্যবহারে ক্ষত বিক্ষত মানব বিবেকের কথা না হয় নাই তুললাম।

নেপোলিয়ন বা আলেক্সজেন্ডার দি গ্রেটেরা হয়তো সময়ের বা/এবং কোন জাতির জন্য নায়ক হ’য়ে ওঠে কিন্তু যে মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড জড়িয়ে থাকে ঐ সব যুদ্ধে তার ইতিহাসের অনেকটাই রয়ে যায় মানব চক্ষুর অন্তরালে। বিভিন্ন ভয় থেকেই হয়তো তারা নেশাগ্রস্থের মত যুদ্ধকেই একমাত্র অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয় কিন্তু গিলগামেশের মত মৃত্যুর ভয়ের কাছে সকলেই পরাজিত হ’য়ে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে যায় যে, তারা অবশেষে শুধুই মানুষ। কে, কি, কখন, কোথায়, কেন, কিভাবে ইত্যাদি যে কোন ধরনের প্রশ্ন-উত্তর ও ব্যাখ্যা এবং বিকল্প ব্যাখ্যা বিষয়ে অর্ধসত্য বা আরোপিত প্রচারনার নয় বরং সত্যান্বেষণের মধ্য দিয়ে সমস্ত ভয়কে জয় করে, একজন আরেকজনের ওপর আস্থা নিয়ে, পারস্পারিক সহবাস্থানের মাঝে বিশ্ব যেদিন নায়ক তৈরী করা শুরু করবে, সেদিন থেকেই তৈরী হবে সত্যিকারের নায়কেরা, স্থায়ীত্ব পাবে মানব সভ্যতা। আর তখনই কোন রাষ্ট্র বা ধর্ম বা জাতির জন্য কোন কুচক্রী মহলের পরিকল্পনাকে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করার প্রয়োজন হবে না, কারণ, মানব সভ্যতার জন্য তখন সকল কিছুই হয়ে উঠবে পরিকল্পনা।

<u>উপসংহার</u>

বেশীর ভাগ মানুষ (সকল মানুষ বললেও ভুল হবে না, কারণ, শতকরার হিসেবে নগন্য অংশই বাইরে থাকবে) তাদের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে নিজের জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী যৌক্তিকতা দিয়ে চরম সত্যের ব্যাখ্যা নিজের মত করে তৈরী করে নেয় কিন্তু সেই যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা যে কল্পিত বা আরোপিত ব্যাখ্যাও হ’তে পারে বা ঐ সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত যে আংশিক উপস্থাপনা হতে পারে অথবা সেই তথ্য-উপাত্তের যে অন্য কোন ব্যাখ্যাও থাকতে পারে সেটা নিয়ে ভাববার প্রয়োজন বোধ করে না। এই বিষয়ে মুসা(আ) এবং খিজির(আ) গল্পটি জানা থাকলে আমার কথাটি পরিষ্কার হ’য়ে যাবে। বেশীরভাগ পাঠকের জানা আছে ধরে নিয়ে গল্পটি এখানে আর উল্লেখ করলাম না। আমার জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী আমার যৌক্তিকতার আলোকে আমরা কোথা থেকে এসেছি-কোথায় যাচ্ছি, বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির পেছনে কোন গোষ্ঠীর কোন চক্রান্তের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে ধর্মের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে আমাদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা চলছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন গুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা ছিল এই লেখায় কিন্তু স্যাটারডে ক্লাবের যৌক্তিক চাপের মুখে যেমন আমার বহু লেখার অনেক কথাই মাঝপথেই আটকে যায়, এই লেখাও তার ব্যতিক্রম নয়।

তাদের দৃষ্টির আড়ালে দু'য়েকটি অযৌক্তিক কথা বলেই ফেলি, আমি মনে করি আমাদের বর্তমান মানব

সভ্যতার বয়স হাজার আষ্টেক বছর এবং আমাদের বর্তমান সভ্যতা আগামী ত্রয়োবিংশ সালের দেখা পাবে না, অর্থাৎ, আগামী ২০০ বছরের কাছকাছি সময়ের মাঝে বিলীন হয়ে যাবে। আর যদি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সঠিক পথ বেছে নেয় তবে হয়তো আরও হাজার দু'য়েক বছর টিকে যাবে এই সভ্যতা। এরপরেও হয়তো এই বিশ্বেই আরও সভ্যতা তৈরী হবে (হ'তে পারে বানর সভ্যতা, আক্ষরিক অর্থে বলছিনা) এবং আমি এটাও বিশ্বাস করি, আমাদের বর্তমান মানব সভ্যতার আগে আরও সভ্যতা ছিল (সেই সভ্যতার নাম যেটাই দেইনা কেন), হাজার দশেক বছর আগে আমাদের ঠিক আগের সভ্যতাটিকে বিলীন করে দেয়া হয়েছে। বলেইছি আগেই, হাজার চারেক বছর আগের ইতিহাসের সঠিক সাক্ষ্য দিতে যেখানে বিজ্ঞানই এখন পর্যন্ত অক্ষম সেখানে হাজার দু'য়েক বা শ'দুয়েক বছর পরের আমার কোন ভবিষ্যতবাণীর যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই।

(সমাপ্ত)